ধারাবাহিক **উপন্যাস**

(পর্ব ১০, ১১ ও ১২)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-১০-

দাঁড়িয়ে থাকে ইমন। খালাম্মার আগের ছবিটা ওর মনে ভেসে উঠে। কত শৌখিন ছিলেন তিনি। কি মধুর ব্যাবহার ছিল তার। কত রকম মজার মজার পিঠা বানাতেন। পিঠার লোভে, সে আর পরিমল সুযোগ পেলেই চলে আসতো পিন্টুদের বাসায় । পিন্টুর বাবা ফজলুল করিম সাহেব ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। খুব নীতিবান অফিসার বলে তার খ্যাতি ছিল। পিন্টুর মায়ের ফুল বাগানের বেশ শখ ছিল। ঘরের সামনে ছিল ফুলের বাগান। তাতে ছিল ফুলের সমারোহ। নীতু কত ফুল তুলেছে সে বাগান থেকে। ইমন তাকিয়ে দেখল, সে ফুল বাগানের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই।

ইমন ঘরের সামনে দাড়িয়ে বুঝতে পারছেনা, এখন সে কি করবে। মনটা ভীষন খারাপ লাগছে ওর। পরিমল বোধ হয় পিন্টুর মৃত্যুর খবর জানে না। জানলে সে ওকে পিন্টুর সাথে দেখা করবার জন্য কুমিল্লা আসতে বলতো না। আবার পিন্টুদের ঘরের দিকে তাকায় ইমন। খোলা দরজা দিয়ে কাউকে নজরে আসে না। বিমুড়ের মত দাড়িয়ে থাকে সে।

পনর-ষোল বছর বয়সী দুটো ছেলে ওর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে।

আপনে কেডা? পিন্টু ভাইরে খুঁজেন ক্যান? ওদের একজন বলে।

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠে ইমন। আমি পিন্টুর বন্ধু। ওর সাথে একসাথে স্কুলে পড়তাম। কবে মারা গেছে সে? কি করে মারা গেল?

চাচীর মাথা খারাপ। তাই আবোল তাবোল বকে। পিন্টু ভাই মরবো কেন? হেরে পুলিশ খুঁজতাছে। তাই পলাতক হইছে।

কেন, পুলিশ খুঁজছে কেন? অবাক হয় ইমন।

আপনে কেডা? অন্য ছেলেটা প্রশ্ন করে এবার।

বললামনা, আমি পিন্টুর বন্ধু।

কেমন বন্ধু হইলেন, বন্ধুর খবর রাখেন না?

আমি বহুদিন বিদেশ ছিলাম বলে যোগাযোগ নাই।

ছেলে দুটো ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে। ওরা যাবার জন্য পা বাড়ায়।

তোমরা কি বলতে পার পিন্টু কোথায়?

না না, আমরা জানিনা। না ফিরেই দু জনে এক সাথে বলে উঠে।

ইমনের কেমন সন্দেহ হয়, ওরা জানে পিন্টু কোথায়। ইচ্ছে করেই মিথ্যা বলছে।

ইমন ছুটে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখ, আমি বিদেশ থেকে এতদুর এসেছি শুধু ওর সাথে দেখা করবার জন্য। বিশ্বাস কর, আমি পুলিশের লোক না। প্লিজ বল, ও কোথায়।

ছেলে দুটো আবার ফিসফিস করে কথা বলে নিজেদের মধ্যে।

আমরা জানি না পিন্টু ভাই কই আছে। আপনে মনোহরপুর তারা লন্ড্রিতে যাইয়া জয়নালরে বিচরাইয়া বার করেন। হে জানলেও জানতে পারে, পিন্টু ভাই কই আছে।

ইমন আর সময় নষ্ট করেনা। একটা রিকসা নিয়ে মনোহরপুর এসে তারা লন্ড্রি পেতেও অসুবিধা হয়না। দোকানের লোকটাকে জয়নালের কথা বলতেই, সে দোকানের পেছনে নিয়ে একটা রুম দেখিয়ে ইমনকে বলে, যান, জয়নাল ভাই ঘরেই আছে। তারপর লোকটা আবার দোকানে চলে যায়।

রুমটাতে ঢুকে ইমন দেখে, একটা লোক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

আপনি কি জয়নাল? নিশ্চিত হবার জন্য বলে ইমন।

হ, কি চান আপনে? শুয়ে শুয়েই জবাব দেয় লোকটা।

আমি পিন্টুকে খুঁজতে এসেছি।

কথাটা শোনার সাথে সাথে ধড়মড় করে উঠে বসে জয়নাল।

আপনে কে? কেডা কইল পিন্টু কই আছে, আমি জানি? ওর কন্ঠে রাজ্যের উৎকন্ঠা।

দেখেন, আমি পুলিশের লোক না। আমি ওর ঘনিষ্ট বন্ধু। এক সাথে স্কুলে পড়েছি। ওকে খুঁজতে এসেছি বিদেশ থেকে। পিন্টুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জানালো, আপনি জানেন, পিন্টু কোথায় আছে।

জয়নাল সন্দেহজনক দৃষ্টিতে ইমনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কোন কথা বলে না।

বিশ্বাস করেন, আমি পুলিশের লোক না। আমি ওর স্কুল জীবনের বন্ধু। জিলা স্কুলে এক সাথে পড়েছি। শুনেছি ও খুব বিপদে আছে। আমি ওকে সাহায্য করতে চাই।
কি কইরা সাহায্য করবেন? জয়নালের স্বর স্বাভাবিক হয়ে আসে। মনে হয় সে ইমনকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করেছে না।

-১১-

জয়নালের দিকে ভালো করে তাকায় ইমন। বয়স বড়জোর বিশ। পাতলা শরীর, ঘোলা চোখ - যেন জণ্ডিশে ভুগছে। সিগারেটে টান দিয়ে খক খক করে কাশে জয়নাল।

আপনে পিন্টু ভাইয়ের কেমন বন্ধু?

এস এস সি পর্যন্ত এক সাথে পড়েছি জিলা স্কুলে। ওর বাড়ীতেই কাটতো আমার বেশীর ভাগ সময়। ওর মা-বাবা আমাকে খুব আদর করতেন। আমার বাবা ছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রফেসর।

আপনার নাম কি?

আমার নাম ইমন; ভাল নাম হাবিবুল বাশার।

হ, পিন্টু ভাই আপনার আর পরিমল দা'র কথা মাঝে মাঝে বলতো। আপনে কই থাকেন এখন?

আমি অষ্ট্রেলিয়া থাকি বছর চারেক ধরে।

জয়নাল ভাল করে ইমন কে দেখে আবার উপর নীচ চোখ বুলিয়ে। পিন্টু ভাইর সাথে দেখা করতে চান কেন? ওনার সাথে দেখা করন নিষেধ। আপনেরে নিয়া গেলে রাগ করব।

না, না, আমাকে দেখলে রাগ করবেনা। দেখি, ওর বিপদের দিনে যদি ওকে সাহায্য করতে পারি।

কি কইরা সাহায্য করবেন। হের জীবনের উপর বহুত খতরা। হের ত বার অওনের উপায় নাই। র‍্যাবের ভয়ে হে পালাইয়া আছে।

আমি ওকে বাইরে নিয়ে যাব। ওর জীবনটা এমন করে নষ্ট হয়ে যেতে দেব না।

ঠিক আছে, চলেন। কিছু মনে করবেন না। আপনারে এক বার সার্চ কইরা দেখব রওয়ানা দেওনের আগে।

কর। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকে ইমন।

জয়নাল ওর পুরো শরীর সার্চ করে দেখে। মোবাইটা অফ করে নিজের কাছে রেখে দেয়।

চলেন।

ওরা ঘরের পেছন দিয়ে বাড়ীটার সীমানায় এসে দাঁড়ায়।

কিছু মনে করবেন না ভাইয়া। বিপদের মাঝ খানে সাবধান হওন লাগে। আপনে খাড়ান, আমি বাইরটা একটু দেইখা আসি। বেরিয়ে যায় সে।

বাইরে মোটামুটি অন্ধকার। সামনের ড্রেন থেকে বাজে গন্ধ আসছে। তার মাঝে ইমন একা দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পর জয়নাল আসে।

মনে হয় সব ঠিক আছে। চলেন।

এ গলি ও গলি করে ওরা একটা বাড়ীতে এসে পৌঁছাল। বাড়ীটা নিরিবিলি। সামনে শুপারী গাছের সারি। পেছনে বেশ কয়েকটা নারকেল আর আম কাঠালের গাছ। জয়নাল ওকে ঘরের বারান্দায় একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে ভেতরে চলে যায়।

কিছুক্ষন পর বেরিয়ে এল জয়নাল। সাথে একজন মহিলা। দেখে মনে হয়, শিঘ্রী বাচ্চা হবে। চোখ ভেজা। মনে হয় কাঁদছিলেন।

পিন্টু ভাই এখানেই থাকে বেশীর ভাগ সময়। আইজ অন্য যায়গায় আছে। আপনে কি হেইখানে যাইতে চান?

এসেছি যখন ওর সাথে দেখা না করে যাব না। দৃঢ়তা ফুটে উঠে ইমনের গলায়।

তা হইলে বসেন, আমি আইতাছি। আবার ভেতরে চলে যায় জয়নাল।

কিছুক্ষন পর আবার বেরিয়ে আসে সে। মাথায় হ্যালমেট, হাতে আরেকটা। হাতের হ্যালমেটটা ইমনের দিকে এগিয়ে ধরে বলে, পরেন।

বাড়ীর পাশ দিয়ে পেছনে যায় জয়নাল। বেরিয়ে আসে একটা মোটর সাইকেল ঠেলে।

বসেন। কয়টা বাজে?

প্রায় নয়টা। পেছনের সীটে বসতে বসতে বলে ইমন।

-১২-

ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার পথে চেকপোষ্ট। মিলিটারী পুলিশ হাত নেড়ে ওদের থামতে বলে। দু জন মিলিটারী পুলিশ নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে। তারপর কি ভেবে, হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বললো।

মোটর সাইকেল আবার চললো ভট ভট করে। ওরা যেতেই ফোন উঠায় মিলিটারী পুলিশ।

হ্যালো, কে বলছেন?

মেজর মমিন বলছি। ও পার থেকে উত্তর আসে।

সালামালাইকুম স্যার। একটা মোটর সাইকেল এখনি ঢাকার দিকে গেল। নাম্বার ..... । যে চালাইতাছে, ওরে দেখে একটু নার্ভাস লাগল।

নাম্বার টা কি বললেন?

নাম্বার টা হইলো ..... । মোটর সাইকেলের নাম্বারটা পুনরাবৃত্তি করে মিলিটারী পুলিশ।

থ্যাঙ্কস ফর দি ইনফরমেশান। আমি এখনি ডাটা বেইসে চেক করে দেখছি। দেখা যাক, কিছু পাওয়া যায় কি না। রাখি। বলে ওপাশের লাইন কেটে যায়।

ক্যান্টনমেন্টেই ছিলেন মেজর মমিন। তাড়াতাড়ি জীপ নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে থেকে বের হবার গেটে অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি। জয়নালদের মোটর সাইকেল এসে যায় একটু পর। নাম্বার মিলিয়ে তিনি ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, ওটাকে ফলো কর।

রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া নেই বললেই চলে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে একটু পর যেতেই রাস্তায় আর বাতি নেই। কুচকুচে অন্ধকারে হেড লাইট জ্বালিয়ে চললো জয়নাল।

ইমন ভাই, দোয়া দরুদ পড়েন। ফিসফিস করে বলে জয়নাল।

কেন?

চারি দিকে পুলিশের উৎপাত। কোনহানে আবার আটকাইয়া দেয়।

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তার পাশে মোটর সাইকেল থামায় সে। একটা ছেড়া রেইন কোট বের করে ইমনকে দেয় পরতে। ইমন জানে, শত চেষ্টা করেও জয়নালকে পরানো যাবেনা সেটা।

অগত্যা অনেক অস্বস্তি নিয়ে রেইন কোট টা গায়ে জড়িয়ে নেয় সে।

জয়নালের গায়ে শুধু জামা। ভিজতে ভিজতেই মোটর সাইকেল চালাচ্ছে সে। ইমনের গায়ের ছেড়া রেইন কোট খুব কাজে আসছেনা। গা টা একটু রক্ষা পেলেও, পা দুটো রক্ষা পাচ্ছেনা।

পেছনে নিরাপদ দুরত্বে র‍্যাবের জীপ। একটা লাইট কালো কাগজ দিয়ে ঢাকা। মেজর মমিন দুরবীন চোখে লাগিয়ে ফলো করছেন জয়নালদের মোটর সাইকেলকে।

জয়নাল রিয়ার ভিউ আয়নায় পেছনে দেখে একটু পর পর। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু বহু দুরে একটা মোটর সাইকেল দেখা যাচ্ছে।

মিনিট দশেক চলার পর পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নামলো জয়নাল। বৃষ্টি হওয়াতে এখানে সেখানে পানি জমে আছে। অনেক কসরত করে, খানা খন্দ এড়িয়ে আগাল সে। মোটর সাইকেল থামিয়ে কিছুক্ষন অপেক্ষা করলো জয়নাল। বারবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, কেউ এদিকে আসছে কি না।

না, কোন শব্দ নাই। কোন আলো নাই। দুরে বড় রাস্তা দিয়ে দু একটা বাস চলে যাচ্ছে শো শো করে। মোটর সাইকেলে সে আর ষ্টার্ট দিল না। কাদা রাস্তায় সেটাকে টেনে টেনে নিয়ে চললো।

মেজর মমিন ড্রাইভারকে বড় রাস্তার উপরেই গাড়ী থামাতে এবং জীপের আলো নিভিয়ে দিতে বললেন। গাড়ীতে বসে তিনি মোবাইল ডাটা টার্মিনালের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ডাটা বেইসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে নিশ্চিত হলেন যে, মোটর সাইকেলটা পিন্টুর। কম্পিউটারের মনিটরে পিন্টুর মুখটা আবার ভালো করে দেখে নিলেন।

না, এ লোকটা মোটর সাইকেলে ছিল না। মনে মনে বললেন তিনি। পিন্টু যেহেতু পলাতক, ওর মোটর সাইকেলটা অন্য কেউ চালানো অস্বাভাবিক নয়। আর মোটর সাইকেলটা যে এখন পিন্টুর কাছে যাচ্ছে, তারও কথা নয়। তবে যেতেও পারে। মোটর সাইকেলটা পিন্টুর কাছে না গেলেও ওটাকে ফলো করলে দরকারী তথ্য মিলতে পারে। ওদের আড্ডার খোজ পাওয়া যেতে পারে। দেখাই যাক না, ওটাকে ফলো করে। টিমকে স্পটে আসার জন্য জরুরী নির্দেশ দিয়ে সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকেন মেজর মমিন।

আকাশে একাদশীর চাঁদ। বৃষ্টি থেমে গেছে। হালকা মেঘ ঘরে বেড়াচ্ছে আকাশময়। মরা জোৎস্নার বুক চিরে কাঁচা রাস্তা দিয়ে চললো জয়নাল। বেশী দুর যেতে হলোনা। একটা সাধারন গেরস্তের উঠানে এসে থামলো ওরা।

আসেন। মোটর সাইকেল থেকে নেমে ইমনকে ডাকল জয়নাল।

একটা ঘরে ঢুকল ওরা। সামনে জয়নাল, পেছনে ইমন। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক মাটিতে বসে ভাত খাচ্ছে।

ওস্তাদ কই আকবর ভাই? জয়নাল প্রশ্ন করলো।

আছে। কারে লইয়া আইছস, উনি কে? কপাল কুচকে লোকটা প্রশ্ন করলো জয়নালকে। খাওয়া দাওয়া করছ?

তাইনে ওস্তাদের বন্ধু, দেখা করতে আইছে। খাওনের কিছু আছে? থাকলে দেন। উনিও খাইবো।

ডিমের শালুন আছে, ভাত নাই। আমি ভাত চড়াইয়া দিতাছি। তোমারে না ওস্তাদ মানা করছে বাইর হইতে। চাইর দিকে র‍্যাবের উৎপাত। বাইর হইছ ক্যান। ওস্তাদ দেখলে রাগ করবো।

ওস্তাদের বন্ধু আইছে বিদেশ থেইকা। কেমন কইরা মানা করি। মাথা চুলকায় জয়নাল। ইমন অপ্রস্তুত বোধ করে।

ওনারে লইয়া ভিতরে যাও। টিকটিকি ফিকটিকি লাগেনাইতো পিছনে?

জয়নাল উঠে দাঁড়ায় । না, ভালা মত দেইখা শুইনা আইছি। হাটতে হাটতে বলে জয়নাল। পেছনে ইমন। ওর বুকটা ধুকপুক করে। ভয়ে না উত্তেজনায়, বুঝতে পারেনা সে।

বসত ঘরের পেছনে গোয়াল ঘর। তার পেছনে একটা ঝুপড়ির মত একটা ঘর; মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। সেই ঘরের সামনে কয়েক মুহূর্ত ইতঃস্তত করে জয়নাল।

যান, পিন্টু ভাই ওখানে আছে। আমি যামুনা। আমারে দেখলে রাগ করবো। আপনে যান। ফিস ফিস করে বলে জয়নাল।

ইমন বাইর থেকে দেখলো, হ্যারিকেনের মৃদু আলোতে একটা লোক মোড়ায় বসে সিগারেট টানছে। মাথায় চুলের বোঝা, গালে চাপ দাড়ি। সেই চাপ দাড়ির জঙ্গল ফুড়ে উকি মারছে চোয়াল দুটো। কি বিষন্ন দুটো চোখ।

না জানা থাকলে সে হয়তো চিনতোনা আমজাদকে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

আমজাদ হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল। ইমনের উপর চোখ পড়তেই ওর চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল।

কে কে? কে আপনি? মোড়া থেকে লাফিয়ে উঠে সে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে।

বস বস, আমি ইমন। জেলা স্কুলের হাবিবুল বাশার ।

আমজাদের চোখের ভয়ের চিহ্ন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় বিস্ময়ে। ইমনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে। ওর চোখ দিয়ে টপ টপ পানি পড়তে থাকে।

ইমন এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ওকে।

ইমন, কি করে আমার খোঁজ পেলি? তুই ক্যান আসলি একটা ডুবে যাওয়া মানুষকে দেখতে, বিপদের মধ্যে নিজকে জড়াতে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে সে। আমি শেষ হয়ে গেছিরে ইমন, শেষ হয়ে গেছি। কেন এলি তুই?

না তুই শেষ হয়ে যাসনি, ডুবে যাসনি। আমরা তোকে টেনে তুলবো আবার।

আমি সত্যি ডুবে গেছিরে ইমন। তুইতো জানিসনা, গত পাঁচ বছরে কি ঝড় বয়ে গেছে আমার উপর দিয়ে।

বল, আমি সব শুনবো। আমরা তিন জন ছিলাম একটা ফুলের তিনটা পাপড়ির মত। আমরা ভেসে থাকবো আর তুই ডুবে যাবি, তা কি করে হয়। পরিমল বলেছে, তুই এম, এ ফাইন্যাল ইয়ারে উঠে নাকি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছিস।

ঠিকই শুনেছিস। তোদের সমাজ ব্যাবস্থা আমাকে আর আগাতে দিল না।

দোষ কার আমার জানার দরকার নেই। তুই বল, তোর এ অবস্থা হলো কি করে? তুই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে ব্রাইট ছিলি। কত আশা ছিল শিক্ষকদের তোকে নিয়ে। কত স্বপ্ন দেখতেন ওনারা তোকে নিয়ে। তোকে নিয়ে আমরা গর্ব করতাম। আবার তোকে পরীক্ষায় হারাতে পারতামনা বলে ঈর্ষাও করতাম। সেই তোর এত বড় অধঃপতন। কেন? কেন? উত্তেজিত হয়ে পড়ে ইমন।

এই নিয়ে ছয় বার ফোন করেছে নীতু ইমনের মোবাইলে। প্রতি বারই মোবাইল সুইসড অফ পাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেবা সে। বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় যায়ে ডিষ্টার্ব না হয়, সে জন্য কি ভাইয়া ফোন অফ করে রেখেছে - না যুক্তিটা ঠিক ধোপে টিকে না। তবে ওরা কি সিনেমা হলে সিনেমা দেখছে? হলে ঢুকার আগে ফোন অফ করে দিয়েছিল, পরে অন করতে ভুলে গেছে। এ যুক্তিটাও মনকে বোঝাতে পারে না সে। তা হলে কেন সে ফোন অফ পাচ্ছে?

আজকালকের ছেলে-মেয়ে গুলো বদের হাড্ডি। বন্ধু-বান্ধব পেলে মা-বাপ, ভাই-বোন সব ভুলে যায়। আপন মনে গজগজ করতে থাকেন মনোয়ারা বেগল।

চলবে...